সঠিক ইসলামী মতবাদ

[আর-রিসালাতুশ শামিয়্যাহ]

আব্দুল আযীয ইবন মারযূক আত-ত্বারীফী

অনুবাদ: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

নিরীক্ষণ ও পূর্ণকরণ:

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ

فصول في العقيدة

[الرسالة الشامية]

الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

ترجمة: د/ أبو بكر محمد زكريا

تدقيق وإكمال الدكتور/ محمد مرتضى بن عائش محمد

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি যাবতীয় প্রশংসার যোগ্য, তাঁর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না, আর তাঁর প্রশংসারও কোনো কূল-কিনারা নেই। সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই জন্য।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, নেই কোনো উপমা, তাঁর কোনো শরীক নেই, নেই কোনো সাদৃশ্য।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর ওপর, তার পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের ওপর দুরূদ পেশ করুন ও সালাম প্রদান করুন।

অতঃপর.........

এটি একটি “সংক্ষিপ্ত আকীদা” যা আমি শামবাসীদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছি। তারা তাদের যমীন ও দেশের বৈধ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে যাচ্ছে, যা শত বছর ব্যাপী নাসারাদের আগ্রাসন, তারপর বিভিন্ন বাতেনী ফির্কার অবৈধ হস্তক্ষেপে জর্জরিত হয়েছিল। আর যার অনিবার্য ফলাফলস্বরূপ সেখানে অনেক ফিতনা-ফাসাদ ও ইসলামের মৌলিক-নীতিমালা ও শাখাসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছিল।

আমার কাছে সেখানকার অধিবাসী ও অধিবাসী নন এমন অনেকেই অনুরোধ করেছেন, যাতে আমি তাদের জন্য সে প্রশ্নের জওয়াব লিখি,

যা রোজ-কিয়ামতে হিসাবের দিনে জিজ্ঞাসিত হবে অর্থাৎ বান্দার ওপর আল্লাহর হক্ক বা অধিকার সম্পর্কে, যার নির্দেশ তিনি নূহ ও তার পরবর্তী প্রত্যেক নাবীকে দিয়েছেন এবং যা দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়েছে উম্মী নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ ইসলামের রিসালাত:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ [الشورى: ١٣]

“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমরা অহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১৩]

খারাপ কামনা-বাসনা ও লালসার ব্যাপকতা লাভের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে কু-প্রবৃত্তিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, কু-প্রবৃত্তির ব্যাপকতার সাথে সাথে মতপার্থক্যও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আর মতপার্থক্য ব্যাপক হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন দল-উপদলেরও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। যখনই আরবী ভাষা-ভাষী ও অন্যান্যদের মাঝে আরবী ভাষা জ্ঞান দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখনই সহজ হয়ে পড়েছে অপব্যাখ্যা ও সন্দেহ-শংসয় দ্বারা পরিতুষ্ট করা, হাদীস ও আয়াতসূহের ভিন্ন অর্থ করার অপচেষ্টা করা। ইসলামের প্রথম যুগে উত্থিত ফির্কাসমূহের মধ্যে যখন এ কাজসমূহ সহজভাবে হয়েছিল, তখন তাদের পরবর্তী লোকদের

মধ্যে সেটা আরও বেশি সহজ ও অনায়াসেই হতে পারে, বিশেষ করে সেখানে যখন কু-প্রবৃত্তি ও সন্দেহ-সংশয়ের বীজ আছে! কারণ, সন্দেহ-সংশয় তো মূলতঃ প্রবৃত্তি থেকে উত্থিত হয়, তারপর তা সন্দেহে রূপান্তরিত হয়, তারপর তা অনুসৃত মাযহাবে পরিণত হয়। এরপর কিছু মানুষ একে সর্বশেষ অবস্থা দেখে গ্রহণ করে নেয়, আর তার প্রথম অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞই থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقٗا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧]

“তবে কি যখনি কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের প্রবৃত্তি মানে না, তখনি তোমরা অহংকার করেছ? অতঃপর (নাবীদের) একদলের ওপর মিথ্যারোপ করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা?” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৭] এখানে কু-প্রবৃত্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে, যা অহংকারে পরিণত হয়েছে, তারপর তা মিথ্যারোপের রূপ গ্রহণ করেছে; আর শেষে তা শত্রুতায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রত্যেক উম্মতে দল-উপদল ও ভ্রষ্ট চিন্তাধারার উন্মেষ এভাবেই ঘটে থাকে।

আর আল্লাহ তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর হক্ক ও হেদায়াত নাযিল করেছেন। সুতরাং যে এটি স্বচ্ছভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সে যেন বিভিন্ন বিবেকের দ্বারা কলুষিত হওয়ার পূর্বেকার প্রথম মূলনীতি থেকে একে গ্রহণ করে। কারণ, অহী হচ্ছে পানির মতো, আর বিবেকগুলো পাত্রের ন্যায়। আল্লাহ তা‘আলা অহী নাযিল করেছেন এবং সেটাকে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে স্থাপন

করেছেন। তারপর নাবী একে সাহাবীগণের কাছে রেখে যান, এরপর সাহাবীগণ একে তাবে‘ঈদের কাছে রেখে যান। যতই নতুন নতুন পাত্রে ঢালা হচ্ছে ততই তাতে ময়লা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ পাত্র হচ্ছে প্রথম পাত্র; আর তা হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপর সাহাবীগণ। ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ»

“আমি আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। যখন আমি চলে যাব তখন আমার উম্মতের ওপর যা ওয়াদা করা হচ্ছে, তা আপতিত হবে। আর আমার সাহাবীগণ আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। অতঃপর যখন আমার সাহাবীগণ চলে যাবেন, তখন আমার উম্মতের ওপর যা আসার কথা বলা হচ্ছে তা এসে যাবে।”[1]

সুতরাং দীনকে অহী তথা কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত আর কোনো কিছু থেকে গ্রহণ করা যাবে না:

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾ [الجمعة: ٢]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩১।

“তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত।” [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২] আর তাই এ দু’টি উৎস ব্যতীত অন্য যেখান থেকেই দীন জানা যাবে, তা হবে বস্তুত মূর্খতা ও অজ্ঞতারই অপর নাম।

আর অহীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ বুঝ হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের বুঝ। আর তাই আমরা অহী যেটার ওপর প্রমাণবহ, যার ওপর সাহাবায়ে কেরামের বুঝ ঐকমত্য পোষণ করেছে এবং যার ওপর উত্তম প্রজন্মের লোকদের ইজমা‘ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটাই উল্লেখ করব। সুতরাং আমরা বলছি:

প্রথম অধ্যায়

আল-ইসলাম: আল্লাহর একমাত্র দীন, তিনি তাঁর বান্দা, চাই সে মানুষ হোক বা জিন্ন, কারও কাছ থেকে এটি ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ﴾ [ال عمران: ٨٥]

“আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫] আরও বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾ [ال عمران: ١٩]

“নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯]

আর ইসলাম হচ্ছে সকল নাবীর দীন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ অহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ‘ইবাদাত কর।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا ١٦٣ وَرُسُلٗا قَدۡ قَصَصۡنَٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرُسُلٗا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤ رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٦٥﴾ [النساء: ١٦٣، ١٦٥]

“নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট অহী প্রেরণ করেছিলাম, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নাবীগণের প্রতি অহী প্রেরণ করেছিলাম। আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকটও অহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে প্রদান করেছিলাম যাবূর। আরও অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দেই নি। আর অবশ্যই আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন। সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৩-১৬৫]

তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবীর নিকট নূহ, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, দাঊদ, সুলাইমান, আইয়্যূব, ইউসুফ, মূসা, হারূন, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা, ইলিয়াস, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘, ইউনুস ও লূত আলাইহিমুস সালামের কথা বর্ণনা করার পর বলেন,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ [الانعام: ٩٠]

“এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন, কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯০]

নাবীগণের দীন মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করে; আর কোনো কোনো শাখা-প্রশাখায় তাতে ভিন্নতা থাকে, সবগুলোতে নয়। শাখা-প্রশাখা পরিবর্তিত হয়, মৌলিক নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন নেই। আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাঈলের জন্য মূসা ও ঈসা নাবীদ্বয়কে পাঠালেন। মূসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিলকৃত তাওরাতের কিছু বিধান তিনি ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে নাযিলকৃত ইঞ্জীলের মাধ্যমে রহিত করেন। ঈসা আলাইহিস সালাম তার জাতিকে বলেন,

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْۚ وَجِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝٥٠﴾ [ال عمران: ٥٠]

“আর আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য যা হারাম ছিল তার কিছু হালাল করে দিতে, আর আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫০] মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালাম তো এমন দু’জন নাবী, যাদেরকে একই জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল; তারপরও তাদের কিছু শাখা-প্রশাখাজনিত মাসআলা ভিন্ন প্রকৃতির হয়েছিল, তাহলে তাদের দু’জন ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে তা কেমন হতে পারে?!

তারপর আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে, পূর্বেকার যত শরী'আত ছিল, তাতেই বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝٧٨﴾ [ال عمران: ٧٨]

"আর নিশ্চয় তাদের মধ্যে একদল আছে যারা কিতাবকে জিহবা দ্বারা বিকৃত করে, যাতে তোমরা সেটাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; অথচ সেটা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে; অথচ সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহর ওপর মিথ্যা বলে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৭] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ﴾ [النساء: ٤٦]

"তারা বাণীগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৬]

এভাবেই সাধারণ মানুষের এবং হক্ক-সত্যে পৌঁছানোর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেমনটি আল্লাহর ইচ্ছা করেছিলেন। আর সেটাকে বিশুদ্ধ করার একমাত্র পথ: নতুন নবুওয়াত। ঠিক সে কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর হক্ক দীনকে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পুনরায় ফেরত দেন। সুতরাং সে নাবীর দীন ব্যতীত কোনো ইসলাম নেই, কোনো হক্ক দীন নেই:

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [ال عمران: ٨٥]

“আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৮৫]

আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রিসালাতকে করেছেন সকল জাতির জন্য সর্বজনীন- হোক তা মানুষ বা জিন্ন, আরব বা অনারব:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨﴾ [سبا: ٢٨]

“আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২৮]

সহীহ হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

“যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! এ উম্মতের মধ্য থেকে যে কেউ, চাই সে ইয়াহূদী হোক বা নাসরানী, আমার সম্পর্কে শুনবে,

তারপর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার ওপর ঈমান না এনে মারা যাবে, সেই আগুনের অধিবাসী হবে।”[2]

আর আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমকে সকল প্রকার বিকৃতি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে হিফাযত করেছেন:

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾ [الحجر: ٩]

“নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯]

===০===

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের ব্যাখ্যা ও তাতে যা এসেছে তা দ্বারা আল্লাহর কী উদ্দেশ্য, তা শুধুমাত্র আল্লাহ-ই বর্ণনা করেছেন তাঁর কিতাবে এবং তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে। মানুষের মধ্যে আল্লাহর নাবীর মত সম্মানিত কেউ নেই, তারপরও তিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে প্রচারক মাত্র। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]

“হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৭] নাবীর ওপর প্রচারের পাশাপাশি অন্য দায়িত্ব হচ্ছে, সেটাকে বর্ণনা করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ۝٥٤﴾ [النور: ٥٤]

“মূলতঃ রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।” [সূরা আন-নূর: ৫৪] তারপর এটা জানাও আবশ্যক যে, সে বর্ণনাটিও মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে।

﴿فَإِذَا قَرَأۡنَٰهُ فَٱتَّبِعۡ قُرۡءَانَهُۥ ۝١٨ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهُۥ ۝١٩﴾ [القيامة: ١٨، ١٩]

“কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন, তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই।” [সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ১৮-১৯]

সুতরাং সুন্নাহ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নাবীর কাছে প্রেরিত অহী:

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝﴾ [النجم: ٣، ٤]

“আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো কেবল অহী, যা তার প্রতি অহীরূপে প্রেরিত হয়।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩-৪] সুতরাং যখনই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো প্রশ্ন করা হতো, আর তার কাছে তাঁর রবের পক্ষ থেকে পূর্ব হতেই কোনো জওয়াব থাকত, তবে তিনি সেটার উত্তর দিতেন, নতুবা তিনি অহীর অপেক্ষা করতেন।

আর নাবীর অনুধাবনের সবচেয়ে নিকটতম মানুষগুলো হচ্ছেন, নাবীর সাহাবীগণ। আর তাই কুরআনের ব্যাপারে তাদের বুঝ-অনুধাবন দলীল হিসেবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য দীনের মধ্যে হালাল-হারাম জনিত বিধান দেওয়ার অধিকার রয়েছে, সে এতে করে আল্লাহর সাথে শরীক হয়ে গেল তাঁর বিধান প্রদানে; আর এটি এমন কুফুরী ও শির্ক যাতে কোনো দ্বিমত করার অবকাশ নেই।

আল্লাহ তা‘আলা তার কিতাব নাযিল করার সাথে সাথে সেটার বাক্যাবলীকে অর্থবহ করেই নাযিল করেছেন। তাঁর কিতাবের বাণীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার অধিকার তিনি স্বয়ং অথবা তিনি যাকে অনুমতি দিয়েছেন সে ব্যতীত অন্য কারও নেই। আর কুরআনুল কারীমে দৃষ্টি প্রদান করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করা দু’টি শর্তেই কেবল সম্ভব:

এক. কোনো ক্রমেই যেন এর একক অর্থ বা সামষ্টিক অর্থ আরবী ভাষা ও আরবদের চিরাচরিত নিয়মের বাইরে না যায়।

দুই. কুরআনুল কারীমে সরাসরি স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত কোনো অর্থের বিপরীত যেনো সেটি না হয়।

সুতরাং যা কিছু আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারারা তখনই পথভ্রষ্ট হয়েছে, যখন তারা আল্লাহর বাণীসমূহের অযাচিত অর্থ বের করেছে; স্পষ্টবাণীর অর্থ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে, যাতে অস্পষ্ট বাণীর অর্থকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলেন,

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝٧٨﴾ [ال عمران: ٧٨]

"আর নিশ্চয় তাদের মধ্যে একদল আছে যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা সেটাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ সেটা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, 'তা আল্লাহর পক্ষ থেকে' অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহর ওপর মিথ্যা বলে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭৮] এখানে আল্লাহ বলেছেন, তারা তাদের জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করেছে কিতাবকেই, অন্য কিছুকে নয়, যাতে করে কিতাবের খুব নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ঐ বিকৃত অংশকে তোমরা কিতাব হিসেবেই মনে কর এবং তারা এভাবে মানুষকে ভালোমত ভ্রষ্ট করতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহর হক: যাবতীয় ইবাদাত কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣﴾ [البقرة: ١٦٣]

“আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, দয়াময়, অতি দয়ালু। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ্ নেই।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৩]

এ-ছাড়া অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল দ্বারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ ﴾ [النساء: ٣٦]

“আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও কোনো কিছুকে তাঁর শরীক করো না।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬]

বস্তুতঃ শির্কে আকবার মানুষের কোনো সৎ আমলকে অবশিষ্ট রাখে না:

﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾ [الزمر: ٦٥]

“আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী করা হয়েছে যে, ‘যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৫] এ সম্বোধনটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাহলে যারা তার থেকে নিম্ন পর্যায়ের তাদের কী অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দার পক্ষ থেকে কৃত শির্ক ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না সে জন্য বান্দা তাওবা করে:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء: ٤٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮] তিনি আরও বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٞ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡ ٣٤﴾ [محمد: ٣٤]

"নিশ্চয় যারা কুফুরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করেছে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।" [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৪]

আর যে কেউ কুফুরীর ওপর মারা যাবে, সে অবশ্যই আগুনে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢١٧﴾ [البقرة: ٢١٧]

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৭]

তিনি আরও বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ١٦١﴾ [البقرة: ١٦١]

“নিশ্চয় যারা কুফুরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের লা‘নত।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: **১৬১**]

কখনও কখনও কোনো কোনো কাফির তার জীবদ্দশায় মানুষের জন্য উপকারী বিবেচিত হয়ে থাকেন, কিন্তু সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে জাগতিক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে নিয়োগ করা, যেমনিভাবে তিনি অন্যান্য উপকারী বস্তুসমূহ মানুষের জন্য নিয়োজিত করেছেন। যেমন, সূর্য, চন্দ্র, বাতাস ও মেঘ। আর এগুলো মানুষের জন্য আরও বেশি উপকারী। কারণ তাদের কুফুরী তো কেবল আল্লাহকে অস্বীকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারা প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানকে অস্বীকার করে না। আর কারও ওপর শাস্তিও আপতিত হয় আল্লাহর হককে অস্বীকার করার কারণে, প্রাকৃতিক কোনো অধিকার অস্বীকারের কারণে নয়।

===০===

চতুর্থ অধ্যায়

ঈমান ও কুফুরী: দু'টি নাম, দু'টি বিধান; যা কেবল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নাযিল হয়। সুতরাং কাউকে দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কাফির বলা যাবে না। আর পৃথিবীর বুকে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কিছু নেই। তারা হয়ত মুমিন, নয়ত কাফির। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢﴾ [التغابن: ٢]

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মুমিন। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ২]

আর এ দু'টি বিধান (কুফুরী ও ঈমান) প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হবে তার ওপর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তাঁর কিতাবে বা তার রাসূলের সুন্নাতে।

আর মুনাফিকরা: তারা:

- হয় কাফির, কুফুরীকে গোপন করেছে এবং ঈমানকে প্রকাশ করেছে। যেমন, কেউ আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলের ওপর ঈমানের কথা প্রকাশ করল, অথচ গোপনে সে এগুলোর ওপর মিথ্যারোপকারী। আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিফাক।
- অথবা তারা মুসলিম, অপরাধ গোপন করেছে, আনুগত্য প্রকাশ করেছে। যেমন, কেউ অঙ্গীকার পালনের কথাটি প্রকাশ করল,

কিন্তু চুক্তিভঙ্গের বিষয়টি গোপন করল। অনুরূপ কথাবার্তায় সত্যবাদিতা প্রকাশ করল, কিন্তু এর বিপরীতটি গোপন রাখল। এটিই হচ্ছে, ছোট নিফাক।

আর মুনাফিকের সাথে আচরণ হবে মুসলিমদের আচরণ, তার প্রকাশ্য রূপের ওপর ভিত্তি করে ও যেমনটি সে প্রকাশ করে সে রকম।

ঈমানদারের সম্পদ ও জানের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে, তা নিষিদ্ধ বা সম্মানিত। আর কাফিরের ক্ষেত্রে, তা নিষিদ্ধ নয়। তবে এ বিধান শর্তহীন নয়; বরং কখনও কখনও কাফিরের জান-মালও নিরাপদ থাকবে, হয় সে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার কারণে অথবা তাকে নিরাপত্তা প্রদানের কারণে অথবা তার দায়-দায়িত্ব মুসলিম সরকার গ্রহণ করার কারণে। আর মুমিনকে তার হত্যাযোগ্য অপরাধের কারণে হত্যা করা যাবI যেমন, হত্যা কিংবা বিয়ের পরও ব্যভিচার করা।

আর তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে কাফির বলা যাবে না, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কাফির বলেছেন:

- যেমন, যে আল্লাহ অথবা তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ করল।
- অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ إِن نَّعۡفُ عَن طَآئِفَةٖ مِّنكُمۡ نُعَذِّبۡ طَآئِفَةَۢ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ مُجۡرِمِينَ ۝٦٦﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

"বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফুরী করেছ। আমরা তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬]

- অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনাকে একগুঁয়েমি বা গোয়ার্তুমির মাধ্যমে মেনে নিতে অস্বীকার করল, তাদের অনুগত হল না।
- অথবা ইসলামের কোনো অকাট্য বিধানকে অস্বীকার করল।
- অথবা আল্লাহর ওপর মিথ্যা বলল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ۝١٠٥﴾ [النحل: ١٠٥]

"যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, তারাই তো শুধু মিথ্যা রটনা করে, আর তারাই মিথ্যাবাদী" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৫]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓۚ أَلَيۡسَ فِي جَهَنَّمَ مَثۡوٗى لِّلۡكَٰفِرِينَ ۝٦٨﴾ [العنكبوت: ٦٨]

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর কাছ থেকে সত্য আসার পর তাতে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বেশি যালিম আর কে? জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়?" [সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৬৮] এ আয়াতে বর্ণিত যুলুম শব্দটিকে কুফুর অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- অথবা কোনো ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য করল। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ۝١١٧﴾ [المؤمنون: ١١٧]

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ্কে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোনো প্রমাণ নেই। তার হিসাব তো তার রব-এর নিকটই আছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৭]

এ বিধান নিম্নোক্ত সব অবস্থাকেই সমভাবে শামিল করে:

- তার ইবাদত পুরোপুরিই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করেছে অথবা অন্যান্য উপাস্যগুলোকে মাধ্যম সাব্যস্ত করেছে। এ সবই কুফুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ١٨﴾ [يونس: ١٨]

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ‘ইবাদাত করছে যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, ‘এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।’ বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনের এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮]

- অথবা, যা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, তা অন্যের জন্য নির্ধারণ করেছে। যেমন, শরী‘আতপ্রবর্তন ও বিধি-বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং তা অন্য কাউকে এমনভাবে দেওয়া যে, তারা হালাল কিংবা হারাম করে। কারণ; শরী‘আতপ্রবর্তন ও বিধি-বিধান দেওয়াকে আল্লাহ তা‘আলা ইবাদত হিসেবে নামকরণ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ﴾ [يوسف: ٤٠]

“বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু মাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদাত না করতে।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০]

- অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য গায়েবী ইলমের দাবী করল। যেমন, জাদু ও জ্যোতিষবিদ্যা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ ﴾ [النمل: ٦٥]

“বলুন, ‘আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৫]

- অথবা জগতে বা জীবনে অথবা মৃত্যুতে সৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمۡ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلۡقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلۡخَلۡقُ عَلَيۡهِمۡۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ ١٦ ﴾ [الرعد: ١٦]

“তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে? বলুন, ‘আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; আর তিনি এক, মহা প্রতাপশালী।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ১৬]

- অনুরূপভাবে যারা মুমিনদেরকে নয় বরং কাফিরদেরকে ভালোবাসা ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ [المائدة: ٥١]

“আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫১]

আর যে ব্যক্তির পক্ষে ইসলাম জানা সম্ভব, তারপরও সে তা বাদ দিল এবং ইচ্ছা করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল- সে কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে, যদিও সে বাস্তবে অজ্ঞ থাকে। কারণ, সে এমন অজ্ঞতার দোষে দুষ্ট, যা তার পক্ষে দূর করা সম্ভব ছিল, কিন্তু সে তা দূর করল না। আর এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡحَقَّۖ فَهُم مُّعۡرِضُونَ ٢٤﴾ [الانبياء: ٢٤]

“কিন্তু তাদের বেশিরভাগই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৪] এখানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তারা অজ্ঞ, কিন্তু তারা ইচ্ছা করেই অজ্ঞ থেকে গিয়েছিল।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ ٣﴾ [الاحقاف: ٣]

“আর যারা কুফুরী করেছে, তাদেরকে যে বিষয়ে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩] আর হক্ক শোনার সময় তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার ফলে হক্কের বিষয়ে বিস্তারিত না জানা কখনও ওযর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এটাই মূলতঃ জাতিসমূহের ভ্রষ্টতার বড় কারণ। কেননা তারা হক্কের

একাংশ শোনে, তারপর তার বিস্তারিত জানা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞ থাকতে, মুখ ফিরিয়ে থাকে।

বস্তুতঃ জাগতিক ও শর‘ঈ দলীল-প্রমাণাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা অধিকাংশ কাফিরদের স্বভাব। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ يَمُرُّونَ عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرِضُونَ ١٠٥﴾ [يوسف: ١٠٥]

“আর আসমান ও যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সবকিছু দেখে, কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৫] তিনি আরও বলেন,

﴿بَلۡ أَتَيۡنَٰهُم بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ﴾ [المؤمنون: ٧١]

“বরং আমরা তাদের কাছে নিয়ে এসেছি তাদের ইজ্জত ও সম্মান সম্বলিত যিকির, কিন্তু তারা তাদের এ যিকির (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৭১]

সুতরাং কোনো বিষয়ে সামান্য জানা থাকার সাথে সাথে সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার হক বিনষ্ট করার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং এর দ্বারা আল্লাহর হক কীভাবে বিনষ্ট হবে?!

আল্লাহর (জাগতিক ও শর‘ঈ) আয়াতসমূহের কাছে বিবেক যদি চিন্তাশীল হয়ে অবস্থান না করে, তাহলে সে আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য বুঝা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে, যেমনিভাবে সেগুলো তাড়াতাড়ি পার করা দ্বারাও সে অনুরূপ উপকার অর্জন থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে সে তা দ্বারা

উপকৃত হতে পারে না, যদিও সে প্রমাণটি শক্তির দিক থেকে প্রবল ও প্রত্যহ দৃশ্যমান হয়ে থাকে:

﴿وَجَعَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ سَقۡفٗا مَّحۡفُوظٗاۖ وَهُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهَا مُعۡرِضُونَ ٣٢﴾ [الانبياء: ٣٢]

“আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশে অবস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩২]

মানুষ তার এ ধারণায় ভুল করে থাকে, যখন সে মনে করে যে, হক্ব সম্পর্কে বিস্তারিত না জেনে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা এবং তাকে পৃষ্ঠদেশের দিকে ছেড়ে রাখা- সেটার ফলাফল ভোগ করা থেকে তাকে ছাড় দিয়ে দিবে।

আর মুখ ফিরিয়ে থাকার কারণ: হয় অহঙ্কার নতুবা অমনোযোগিতা ও ভোগমত্ততা। আর এ কারণেই যখন বিপদাপদ নাযিল হয়, তখন তা তার অহঙ্কার দূর করে দেয়, তার ভোগের আনন্দ হারিয়ে যায়। ফলে সে হক্ব দেখতে পায় এবং সেটার দিকে ফিরে আসে।

===o===

পঞ্চম অধ্যায়

আল-ঈমান: কথা, কাজ ও বিশ্বাস। এ তিনটির সবগুলো মিলেই ঈমান। যেমনিভাবে মাগরিব তিন রাকাত। তা থেকে যদি এক রাকাত কমানো হয়, তবে সেটাকে মাগরিব বলা যাবে না; তেমনিভাবে ঈমান থেকে কথা, কাজ বা বিশ্বাস- এ তিনটির কোনো একটি কমানো হলে সেটাকে ঈমান নাম দেওয়া যাবে না।

আর আমরা এ তিনটিকে ঈমানের শর্ত কিংবা ওয়াজিব অথবা রুকন বলব না, যদিও এ সব পরিভাষার কোনো কোনোটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রদান করে থাকে। কারণ, এর কোনো কোনোটি ভুল অর্থ আবশ্যক করে নিতে পারে।

আর এ তিনটি (যার একটি না হলে ঈমানও নাই হয়ে যায়) এর হাকীকত বা বাস্তবতা তা-ই, যা মুহাম্মাদী শরী'আতের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বিশ্বাসের অর্থ 'মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা' এবং 'হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকা' হবে না। কেননা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকলেও অধিকাংশ অন্তরেই এরূপ অহিংসা ও কল্যাণকামিতার প্রতি টান থাকে। **বরং বিশ্বাস দ্বারা উদ্দেশ্য:** অন্তরের বিশেষ কথা ও কাজ।

অন্তরের কথা হচ্ছে: এ কথার সত্যায়ন করা যে, আল্লাহ ব্যতীত হক্ব কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রব থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তা হক্ব ও বাস্তব।

আর অন্তরের আমল বা কাজ হচ্ছে: আল্লাহকে, তাঁর নাবীকে ও দীন-ইসলামকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা, আর আল্লাহর ইবাদতে তাঁর প্রতি নিষ্ঠা অবলম্বন।

কথা-বার্তায় সত্য বলা, পিতা-মাতার প্রতি নম্র সম্ভাষণ করা, সালাম বিনিময় করা, পথহারা পথের দিশা প্রদান ইত্যাদি **সাধারণ কল্যাণমূলক শব্দেই *ঈমানের অংশ 'কথার'* উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ নয়।** কেননা এ কাজগুলো সকল আত্মাই ভালোবাসে, যদিও সে আল্লাহর সাথে কুফরকারী, তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী হয়। **বরং এই কথা দ্বারা উদ্দেশ্য** তা-ই, যা মুহাম্মাদী রিসালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। **আর তার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে,** কালেমাদ্বয়ের সাক্ষ্য প্রদান, তাসবীহ ও তাকবীর।

অনুরূপভাবে সাধারণভাবে যে সৎকাজ বুঝায় 'আমল বা কাজ' সেটায় সীমাবদ্ধ নয়, যেমন, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ, ফকীরদের খাবার খাওয়ানো, অত্যাচারিতদের সাহায্য করা, মেহমানদের সম্মান করা। কেননা এগুলোর প্রতি সব আত্মারই ঝোঁক রয়েছে, যদিও তাতে ঈমান না থাকে। **বরং *ঈমানের অংশ আমল* দ্বারা উদ্দেশ্য:** সে আমল বা কাজ, যা প্রচারের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে নির্দেশিত ছিলেন। যেমন সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি।

আর যেসব সৎকাজের ব্যাপারে সকল আসমানী রিসালাত ও মানুষের স্বভাব প্রমাণবহ, এমন সব কাজ একান্তভাবে ইখলাস বা নিষ্ঠাসহকারে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হলে তাতে ঈমান বর্ধিত হয়। যেমন, মানুষের

জন্য কল্যাণ পছন্দ করা, কথা-বার্তায় সত্যবাদী হওয়া, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, ফকীর-মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ানো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো না হলে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায় না, যেমনিভাবে সেগুলো পাওয়া গেলেই ঈমান পাওয়া যায় না। বরং এগুলো প্রমাণ করে যে, সে-ব্যক্তির মাঝে ফিতরাত তথা স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা বিদ্যমান এবং মানুষের সৃষ্টিগত মানবিকতা তার মাঝে পরিবর্তিত হয় নি, আর সে হক্ক গ্রহণের বেশি নিকটবর্তী:

﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ﴾ [الروم: ٣٠]

"আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি), যার ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩০]

আর ঈমান: বাড়ে ও কমে, আবার একেবারে চলেও যায়। আনুগত্যের কারণে বৃদ্ধি পায়, গুনাহের কারণে কমে যায়, তবে কুফুর বা শির্ক না-হলে একেবারে চলে যায় না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا﴾ [الانفال: ٢]

"মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে।" [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَيَزۡدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنٗا﴾ [المدثر: ٣١]

"আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে যায়।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩১]

তিনি আরও বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡۗ﴾ [الفتح: ٤]

"তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৪]

কুফুরীর পরে ঈমান কেবল তখনই সাব্যস্ত হবে যখন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকবে:

- বিশ্বাস: অন্তরের কথা দ্বারা। আর সেটা হচ্ছে, রিসালাতে বিশ্বাস। আর অন্তরের আমল দ্বারা। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা ভালোবাসেন তা পছন্দ করা।
- অতঃপর মুখের কথা।
- তারপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।

আর যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণ করে নি, সে মুমিন নয়।

আর যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর তার জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণও করেছে, কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত যে আমল রয়েছে সেগুলোর ওপর

আমল করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর ওপর আমল করে নি, সে মুমিন নয়।

আর যে ব্যক্তি উচ্চারণ করতে অথবা আমল করতে সচেষ্ট ছিল, কিন্তু করতে সক্ষম হয় নি: তাহলে তার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

“আল্লাহ্ কারো ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

তিনি আরও বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ ﴾ [الطلاق: ٧]

“আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না।” [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ৭]

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্লাহর রয়েছে সুউচ্চ গুণাবলী এবং সুন্দর নামসমূহ, আর আল্লাহ সম্পর্কে মহান সত্ত্বা নিজের চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তাই তিনি নিজে, তাঁর কিতাবে ও তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে, যা তাঁর নিজ থেকে সাব্যস্ত করতে অস্বীকার করেছেন: আমরাও তা অস্বীকার করব। আর যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন: আমরাও তা সাব্যস্ত করব। তাছাড়া আমরা তার থেকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি অস্বীকার করব, তবে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে বলব, আর তার জন্য যাবতীয় পূর্ণগুণগুলো সাব্যস্ত করব, তবে সেটাকে বিস্তারিতভাবে বলব। আর আমরা সেগুলোর ধরণ নির্ধারণ করব না, সেগুলোর উপমা পেশ করব না এবং সেগুলোর সাদৃশ্য তুলে ধরবো না।

আর যে কেউ তাঁর বিস্তারিত দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করবে, আমরাও তখন সে দোষ-ত্রুটি বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করব। যেমন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে অস্বীকার করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَمۡ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٞۖ﴾ [الانعام: ١٠١]

“তাঁর সন্তান হবে কীভাবে? তাঁর তো কোনো সঙ্গিনী নেই।” [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১০১]

তিনি আরও বলেন,

﴿لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣﴾ [الاخلاص: ٣]

“তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি।” [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ৩] অনুরূপভাবে ইয়াহূদীদের দ্বারা তাঁকে কৃপণ হওয়ার দোষ দেওয়াতে তিনি বিস্তারিতভাবেই সেটাকে অস্বীকার করেছেন:

﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغۡلُولَةٌۚ غُلَّتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْۘ بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]

“আর ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ। তাদের হাতই রুদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা যা বলে সে জন্য তারা অভিশপ্ত, বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৪]

আর আমরা অহী যেভাবে এসেছে সেভাবেই সেটাকে রেখে দেব। যেমন, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত আগত বিষয়গুলো: আমরা সেগুলোর বাস্তবতা সাব্যস্ত করি, সেগুলোর কিছু প্রভাব প্রত্যক্ষ করি, তার চেয়ে বাড়িয়ে কিছু বলি না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর মতো কোনো কিছু নেই। তিনি বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورا: ١١]

“কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

আল্লাহর গুণগুলোকে কোনো কিছুর ওপর কিয়াস বা অনুমান করা যাবে না। কারণ কিয়াস হতে হলে মূল ও শাখার প্রয়োজন পড়ে। আর আল্লাহ হচ্ছেন এমন এক সত্ত্বা যার কোনো সদৃশ নেই। সুতরাং কোনো শাখা

তাঁর নিকটেও পৌঁছুতে পারে না, আর কোনো মূল তাঁর উপরে থাকতে পারে না। তিনি একক, অমুখাপেক্ষী, জন্ম দেন নি, জন্ম নেন নি, আর কেউ তার সমকক্ষ নেই।

আর মানুষের বুদ্ধি-বিবেক যন্ত্রসদৃশ, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে যে, সে যা শোনে, বা যা দেখে তার ওপর কিয়াস করে। ফলে সে আল্লাহ কর্তৃক তার নিজ সম্পর্কে দেওয়া খবর বা সংবাদ শুনে, অথচ সে তাঁকে এর আগে দেখে নি, তখন সে তার দেখা সবচেয়ে নিকটতম উদাহরণটির ওপর সেটাকে কিয়াস করে এবং যা সে দেখেছে সেটা অনুসারে তার ধরণ বর্ণনা করে, কিন্তু আল্লাহ, বিবেকসমূহে তো তাঁর সদৃশ কোনো কিছু নেই। সুতরাং কোনো খারাপ উদাহরণ মনে উদিত হওয়ার কারণে সেটাকে অস্বীকার করতে গিয়ে, সে গুণ বা নামকে তাঁর থেকে অস্বীকার করে তাঁর কোনো নাম বা গুণকে আমরা অর্থহীন করব না। কারণ, এতে করে আমরা বাতিল কিয়াসও অস্বীকার করব, আবার সহীহ কোনো খবরে মিথ্যারোপ করার মত গুনাহে পতিত হবো। কিন্তু তা না করে আমরা, মনে যে খারাপ অর্থ উদিত হবে তা অবশ্যই অস্বীকার করব, আর সাথে সাথে আল্লাহ নিজে তাঁর নিজের জন্য যে গুণ ও নাম সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করব, তারপর সেখানেই অবস্থান করব (অর্থাৎ বাড়িয়ে বা কমিয়ে কিছু বলব না)। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا ١١٠﴾ [طه: ١١٠]

“তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১১০]

তিনি আরও বলেন,

﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٠٣﴾ [الانعام: ١٠٣]

“দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১০৩]

আর আল্লাহ তা‘আলা উর্ধ্বাকাশে তাঁর ‘আরশের উপর রয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٤﴾ [الحديد: ٣، ٤]

“তিনিই প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য (উপরে) ও গোপন (নিকটে); আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন- তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন,

আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৩-৪]

এখানে তিনি সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি স্বয়ং উপরে উঠেছেন, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। আরও জানিয়েছেন যে, তিনি তার বান্দাদের সাথেই রয়েছেন। সুতরাং তিনি তাঁর জ্ঞানে, শ্রবণে ও চোখের সামনে থাকার মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের সাথে রয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ﴾ [الحديد: ٤]

“আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৪] আর তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথেও থাকেন- এগুলোর মাধ্যমে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও হিফাযতের দ্বারাও। যেমন, আল্লাহ মূসা ও হারূনকে বলেছিলেন,

﴿لَا تَخَافَآۖ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ٤٦﴾ [طه: ٤٦]

“আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬]

আর আল্লাহর রয়েছে ব্যাপক সর্বব্যাপী পূর্ণাঙ্গ ইচ্ছা। সুতরাং তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। তিনি যেভাবে তা তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন আমরাও তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত করব। এর চেয়ে এগিয়ে কোনো কিছুর আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না, যেমনটি কোনো কোনো আকলানী তথা বুদ্ধিজীবি বলে পরিচিত লোকেরা করে থাকে।

তারা অসম্ভব কর্মকাণ্ডের আলাপচারিতা এবং পরস্পর বিরোধী মতামত একত্র করা ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ ۝٤٠﴾ [ال عمران: ٤٠]

"তিনি বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪০]

মহান সত্ত্বা আরও বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ۝٢٥٣﴾ [البقرة: ٢٥٣]

"কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছে তা করেন।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৩]

মহান সত্ত্বা আরও বলেন,

﴿ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ ۝١٥ فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ ۝١٦﴾ [البروج: ١٥، ١٦]

"আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।" [সূরা আল-বুরূজ, আয়াত: ১৫-১৬]

আর আমরা আল্লাহর জন্য এমন সবকিছুই সাব্যস্ত করব, যা অহী দ্বারা আগত ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আর যা সাব্যস্ত হয় নি সে ব্যাপারে চুপ থাকব। আর বিবেক-বুদ্ধি যে সকল দোষ-ত্রুটি সাব্যস্ত করতে অস্বীকৃতি জানায় আমরা সেগুলোকে অস্বীকার করব, যদিও সেগুলোর অস্বীকৃতি অহীর ভাষ্যে উল্লেখিত হয় নি। যেমন, চিন্তা-পেরেশানি, কান্না-কাটি, ক্ষুধা ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়

কুরআন আল্লাহর বাণী বা কথা, কুরআনের শব্দ, আয়াত ও সূরাসহ তিনি বাস্তবেই কথাগুলো বলেছেন। আমরা বলব না যে, *কুরআন দ্বারা শুধু অর্থই উদ্দেশ্য,* কিংবা *এ শব্দগুলো দ্বারা প্রকৃত কুরআনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে*। আর আমরা বলব, তিনি সবসময়, যখন ইচ্ছা তখনই কথা-বার্তা বলেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا﴾ [النساء: ١٦٤]

“আর অবশ্যই আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ [الاعراف: ١٤٣]

“আর মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৪৩]

আর তাঁর কালাম বা বাক্যই হচ্ছে তাঁর কথা:

﴿وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ﴾ [الاحزاب: ٤]

“আর আল্লাহ সত্য কথাই বলেন।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪]

আর আল্লাহর বাণী ও কথা অন্তরসমূহ সংরক্ষণ করে রাখে:

﴿بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ﴾ [العنكبوت: ٤٩]

“বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, বস্তুত *তাদের অন্তরে এটা* স্পষ্ট নিদর্শন।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৯]

আর আল্লাহর কথা কানে শ্রুত হয়:

﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]

“আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬] আর যদিও আল্লাহর বাণী কুরআনের প্রচারক ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু এই কারণে তা আল্লাহর কথা থেকে বের হয়ে যায় নি।

আর আল্লাহর বাণী কাগজের ছত্রে লিপিবদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكِتَٰبٖ مَّسۡطُورٖ ٢ فِي رَقّٖ مَّنشُورٖ ٣﴾ [الطور: ٢، ٣]

“শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে; উন্মুক্ত পাতায়।” [সূরা আত-তূর: ২-৩] কুরআনকে আল্লাহ লাওহে মাহফূযে তাঁর কাছে সংরক্ষণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ ٢١ فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۢ ٢٢﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]

“বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।” [সূরা আল-বুরূজ, আয়াত: ২১, ২২]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَإِنَّهُۥ فِيٓ أُمِّ ٱلۡكِتَٰبِ لَدَيۡنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ٤﴾ [الزخرف: ٤]

“আর নিশ্চয় তা আমাদের কাছে উম্মুল কিতাবে; উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হিকমতপূর্ণ।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৪]

আর কাগজের ছত্রে লেখার কারণে সেটা আল্লাহর কথা থেকে বের হয়ে যায় না। কারণ, কাগজ সৃষ্ট বস্তু, অনুরূপভাবে কালিও (কিন্তু যাতে যা লিখা হয়েছে তা আল্লাহর কথা।) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَوۡ نَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ كِتَٰبٗا فِي قِرۡطَاسٖ﴾ [الانعام: ٧]

“আমরা যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৭] এখানে কিতাবকে এক বস্তু আর কাগজকে আরেক বস্তু সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আর এ কুরআন যদিও সৃষ্ট কলম দিয়ে ও সৃষ্ট কালি দিয়ে লেখা হয় তবুও যে তা আল্লাহর-ই কথা, সেটা সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ﴾ [لقمان: ٢٧]

“আর যমীনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরও সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না।” [সূরা লুকমান, আয়াত: ২৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا ١٠٩﴾ [الكهف: ١٠٩]

“বলুন, ‘আমার রব-এর কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে আমার রব-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমরা এর সাহায্যের জন্য এর মত আরো সাগর আনলেও।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১০৯]

সুতরাং যা কলম লিখেছে আর যা কলম দিয়ে লিখা হয় নি সবই সমভাবে আল্লাহর কথা বা বাণী।

আর যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহর বাণী সৃষ্ট, সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা তাঁর কথা তাঁর গুণাবলীর মধ্য থেকে একটি গুণ। আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কথা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثِيثٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۢ بِأَمۡرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤﴾ [الاعراف: ٥٤]

“নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়!” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এখানে তিনি তাঁর সৃষ্টি, অর্থাৎ আসমান ও যমীন, সূর্য, চন্দ্র ও তারকা এবং তার নির্দেশ, অর্থাৎ মহান আল্লাহ সুবহানাহু এর কথা, যার দ্বারা তিনি সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্বে এনেছেন, **এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন**। তিনি বলেছেন, "এ সবই তাঁর নির্দেশের অনুগত"।

আর আল্লাহ তা'আলা পাঠকদের স্বর সৃষ্টি করেছেন, আর এটা করেছেন দু' ঠোঁট, জিহ্বা, গলা, বাতাস, লালা ও তার নড়াচড়া সৃষ্টি করার মাধ্যমে। কিন্তু তা এটা বোঝায় না যে, শ্রুত বস্তুটি আল্লাহর কথা নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَدۡ كَانَ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٥]

"অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ৭৫] সুতরাং যা শ্রুত হয়, তা অবশ্যই আল্লাহর কালাম বা বাক্য, যদিও কোনো পাঠক সেটা উচ্চারণ করে থাকে। যেমন, কোনো কোনো আলিম বলেছেন, আওয়াজ বা স্বর হচ্ছে পাঠকের স্বর, আর কথা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার কথা"।

===o===

অষ্টম অধ্যায়

কুরআন সুন্নাহর ভাষ্য ও বিবেকের সম্মিলনে আমরা শরী‘আতের বাস্তবতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারি। যার বিবেক নেই সে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, আর যার কাছে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য নেই সেও বিবেক দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। এ দু’টির কোনো একটি কমতি থাকলে হক চেনাতেও কমতি হয়ে থাকে। আর প্রকাশ্যভাবে এ দু’টি যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তখন সেখানে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যকে বিবেকের ওপর স্থান দিতে হবে। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য হচ্ছে পূর্ণস্রষ্টার জ্ঞান, আর বিবেক হচ্ছে, অপূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির জ্ঞান।

আর বিবেক হচ্ছে চোখের ন্যায়, পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য হচ্ছে আলোর ন্যায়। ঘোর অন্ধকারে দ্রষ্টা তার চোখ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। অনুরূপভাবে অহী ব্যতীত বিবেকবান ব্যক্তি তার বিবেক দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। যতটুকু আলো থাকবে চোখ ততটুকু পথ দেখতে পাবে, যতটুকু অহী থাকবে বিবেক ততটুকু সঠিক পথের দিশা পাবে। আর বিবেক ও অহীর পূর্ণতা দ্বারাই হিদায়াত ও দিব্যদৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করে, যেমনিভাবে দ্বিপ্রহরের আলোতে দেখা পূর্ণতা পায়।

﴿أَوَ مَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورٗا يَمۡشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ﴾ [الانعام: ١٢٢]

“যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমরা পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২২]

বিবেকবান তার বিবেক দ্বারা দুনিয়াতে উপকৃত হয়, যেমনিভাবে স্বভাব-জ্ঞানের মাধ্যমে যাবতীয় উড়ন্ত ও চলন্ত প্রাণীকুল উপকৃত হয়ে থাকে। সেগুলো সুর্নির্দিষ্ট সময়ে বিচরণ করে, আবার অবতরণও করে, পরস্পরকে চিনতে পারে, নিজেদের ভূমির দিশা পায়, আপন নীড় রচনা করে, তাদের শত্রুদের চিনতে পারে।

কিন্তু মানুষ তার বিবেকের দ্বারা তার রবের কাছে যাওয়ার পথের দিশা পায় না বিস্তারিতভাবে, যতক্ষণ না এর সাথে রবের নাবীর কাছে নাযিলকৃত অহীর অনুসরণ করা না হয়। তাঁর কাছে সে এ ছাড়া অন্য কোনোভাবেই পৌঁছুতে পারবে না। বরং সে তা ব্যতীত সে অন্ধকারেই থেকে যায়:

﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

“আল্লাহ তাদের অভিভাবক, যারা ঈমান আনে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফুরী করে, তাগূত তাদের অভিভাবক। এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৭]

এখানে আল্লাহ বলেন, "তিনি তাদেরকে বের করে আলোতে নিয়ে যান"। কারণ, তা ব্যতীত তারা অন্ধকারে প্রবেশকারী। আর যেমনিভাবে দীপ্তিময়তা একই, যদিও এর প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হয়- আলো বা আগুন; তেমনিভাবে অহী একই, যদিও এর প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হয়- কুরআন বা সুন্নাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

আর যে ব্যক্তি বলে যে, সে অহী ব্যতীত শুধু তার বিবেক দ্বারা আল্লাহর কাছে পৌঁছার দিশা পাবে, সে যেন বলল, সে আলো ব্যতীত শুধু চক্ষু দ্বারা পথের দিশা লাভ করবে। বস্তুতঃ তারা প্রত্যেকেই অকাট্য অত্যাবশ্যক বিষয়কে অস্বীকারকারী। প্রথমজন দীনদ্রোহী, আর দ্বিতীয় জন দুনিয়াদ্রোহী!

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অহীকে নূর বা আলো নামে অভিহিত করেছেন, যার দ্বারা প্রত্যেক সৃষ্টি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়:

﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

"কাজেই যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে নাযিল হয়েছে সেটার অনুসরণ করে,

তারাই সফলকাম।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭] এটাই তো নাবীদের পথ দেখায়, আর তাদের অনুসারীদের দিশা দেয়।

আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন, আর যেগুলো থেকে নিষেধ করেছেন, আমরা সেগুলো মেনে নিই, আর যা কিছুর সংবাদ দিয়েছেন, আমরা সেগুলো বিশ্বাস করি। যদি তার কারণ জানা যায় তো তাতে ঈমান আনব, আর যদি জানা নাও যায় তবুও আমরা ঈমান আনব ও কায়মনোবাক্যে মেনে নেব। কারণ, সব বিবেকগ্রাহ্য বস্তুই সকল বিবেকের ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকে না। আর তাহলে যা বিবেক আয়ত্ব করতে পারে না, আর তাতে সকল বিবেক একমত হতে বলা হয়, সেটা কীভাবে হতে পারে?!

আর যে ব্যক্তি বলে, “আল্লাহর হুকুম বা বিধানের শুধু ততটুকুতেই ঈমান আনব যতটুকু বিবেকগ্রাহ্য, আর যা বিবেকগ্রাহ্য নয় অথবা আয়ত্ব করতে পারে না, তাতে ঈমান আনব না”, বস্তুত সে এর মাধ্যমে বিবেককে অহীর ওপর স্থান দিয়েছে। কারণ, যা বিবেক আয়ত্ব করতে পারে না তার অর্থ এ নয় যে সেটার অস্তিত্ব নেই; বরং এটা বলা যাবে যে, বিবেক সেটাকে আয়ত্ব করতে পারে নি। কেননা বিবেকের বিশেষ সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেখানে গিয়ে সে শেষ হয়। যেমন চোখের রয়েছে সীমা, যেখানে গিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; কিন্তু সৃষ্টি ও অস্তিত্বজগত সে সীমাবদ্ধতার কারণে নিঃশেষ হয়ে যায় না। দেখুন না, পিপড়ার রয়েছে আওয়াজ বা স্বর, কিন্তু সেটা শোনা যায় না; আর

জগতে রয়েছে এমন মহাশূন্য, তারকা ও নক্ষত্ররাজি- যেগুলো দৃশ্যমান নয়।

===O===

নবম অধ্যায়

শরী'আত (বিধানপ্রবর্তন) একমাত্র আল্লাহর, তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যা ইচ্ছে হালাল করেন, আর যা ইচ্ছে হারাম করেন। আর তাঁর শরী'আত আগত হয়েছে দীন ও দুনিয়ার কল্যাণার্থে। তাঁর নির্দেশনা ব্যতীত, কোনো মুকাল্লাফ (তথা আদেশ-নিষেধের আওতাধীন ব্যক্তি) এর ওপর থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানে তাঁর আদেশ ও নিষেধ রহিত হয়ে যাবে, এমনটি হতে পারে না।

আমরা আল্লাহর শরী'আতের ক্ষেত্রে দীন ও দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য করি না, বরং তা সবই দীনী এবং দুনিয়াবী তাকলীফ বা অবশ্য পালনীয় নির্দেশনা:

দীনী তাকলীফ: যেমন, সালাত, সাওম, হজ, যিকির, মসজিদ আবাদকরণ।

দুনিয়াবী তাকলীফ: যেমন, বেচা-কেনা, বিয়ে-শাদী, তালাক, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান।

যে কেউ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করবে: দীনী ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম নির্ধারণ করবে, আর দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও বিধান প্রদান করবে- সে অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে। কারণ, শরী'আত সম্পূর্ণটি কেবল আল্লাহরই। যে ব্যক্তি এটিকে অন্য কারও হক বা অধিকার বানাবে, সে যেন সিজদাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে ফিরালো।

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ [يوسف: ٤٠]

"বিধান দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত না করতে।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০]

বনী ইসরাঈল তথা ইয়াকূবের বংশধররা মূলতঃ এভাবেই কাফির হয়ে গেছে।

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾ [التوبة: ٣١]

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-পুত্র মসীহকেও। অথচ এক ইলাহের 'ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল; তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি কত না পবিত্র!" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১] সুতরাং আল্লাহ তাদের এ কাজকে শির্ক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আর আল্লাহ তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন, তাঁর শরী'আত প্রবর্তন করেছেন, আর তিনি জানেন যে, সামনে কি অবস্থা আসতে যাচ্ছে, আর পিছনে কি ঘটনা চলে গেছে, যেমনিভাবে তিনি যে সময় ও অবস্থায় রাসূলের ওপর শরী'আত নাযিল হয়েছে তা সম্পর্কে যথার্থভাবে জানেন ও দেখেন। পূর্ব সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে কিংবা পরবর্তী সময়ে

ঘটার কারণে কোনো ঘটনার জ্ঞান তার জ্ঞানে কমতি হয় না, আর বর্তমানে ঘটার কারণে কোনো ঘটনার জ্ঞান তাঁর জ্ঞানকে বর্ধিত করে না। মোটকথা, পূর্ব ও পর, উপস্থিত ও অনুপস্থিতের জ্ঞান আল্লাহর কাছে সমান, তিনি কতই না পবিত্র ও মহান!

আর যদি কেউ মনে করে যে, আল্লাহর বিধান কেবল সে যুগের জন্যই উপযোগী যে যুগে তা নাযিল হয়েছে, অন্য যুগের মানুষ নিজেরা যা উপযোগী মনে করে তা প্রবর্তন করার অধিকার রয়েছে, আল্লাহর বিধানের বিরোধী হলেও এ রকম বিশ্বাস কুফুর। কারণ, এ কথার প্রবক্তা দেখে যে, মানুষের উপস্থিত ও অনুপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞান বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে, আর তা অনুসারে তাদের বিচার-বিবেচনাতেও ভিন্নতা আসে। তারপর সে মনে করে যে, আল্লাহর জ্ঞানও হয়তো এরকমই। এভাবে মানুষ তার বর্তমানের জ্ঞানকে অহী নাযিলকালীন আল্লাহর গায়েবী জ্ঞানের ওপর প্রাধান্য দেয়। বস্তুতঃ যা কুফুরী ও শির্ক। আল্লাহর জ্ঞান তো উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্ব ব্যাপারেই সমান।

﴿عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ۝٩٢﴾ [المؤمنون: ٩٢]

“তিনি গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানী। সুতরাং তারা যা কিছু শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।” [সূরা মুমিনূন, আয়াত: ৯২]

আর উপস্থিত বিষয়াদির ব্যাপারে আল্লাহর দেওয়া বিধান, অনুপস্থিত বিষয়াদিতে তাঁর বিধানের মতোই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ عَٰلِمَ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ أَنتَ تَحۡكُمُ بَيۡنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ٤٦﴾ [الزمر: ٤٦]

"বলুন, হে আল্লাহ, আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, গায়েব ও উপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে সে বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন যাতে তারা মতবিরোধ করছে।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৬] তিনি তাঁর উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল বান্দার মধ্যেই ফয়সালা দিয়ে থাকেন।

আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিধি-বিধানকে দীনী বিধি-বিধান থেকে পৃথক করে; আল্লাহকে শুধু দীনের জন্য শরী'আত প্রবর্তনকারী এবং মানুষদেরকে দুনিয়ার জন্য শরী'আত বা বিধান প্রবর্তনকারী বানায়; যেমনটি তথাকথিত উদারপন্থীরা (!) বলে থাকে, বাস্তবে এর মাধ্যমে সে একাধিক শরী'আত প্রণেতা সাব্যস্ত করে, অথচ শরী'আত প্রদানের একমাত্র অধিকার আল্লাহর।

﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ﴾ [البقرة: ٨٥]

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফুরী কর?" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৫] সুতরাং কেউ যদি কিতাবের কোনো অংশের সাথে কুফুরী করে, সে পুরোটার সাথেই কুফুরী করল।

আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের কাছে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যা নাযিল হয়েছে তা দ্বারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ﴾ [المائدة: ٤٩]

“আর আপনি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করুন ও তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হোন, যাতে আল্লাহ আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তারা এর কোনো কিছু হতে আপনাকে ফেতনায় না ফেলে।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৯] এখানে **উদ্দেশ্য:** ঝগড়া-বিবাদে এবং তাদের মধ্যকার সংঘটিত মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে বিচার-ফয়সালা। **আর ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে,** আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া।

আর যে বিষয়ে অহী বিস্তারিত কিছু বর্ণনা করে নি, সেখানে ইজতিহাদ করার অধিকারীগণের অধিকার রয়েছে বিস্তারিত বর্ণনা করার; তবে শর্ত হচ্ছে, আল্লাহর কোনো প্রমাণিত হুকুম বা বিধানের সাথে তা সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

আর আল্লাহর হুকুম বা বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক মানুষের হুকুম বা বিধি-বিধান ও তাদের পছন্দকে কোনোভাবেই অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। যদি জনগণ প্রদত্ত বিচারই প্রাধান্য পেত, তবে নাবীগণ হকের বাইরে ছিলেন -এ-কথা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ, তারা তো এমন জাতির মধ্যে বড় হয়েছেন যারা বাতিলের ওপর একমত ছিল অথবা তাদের অধিকাংশ বাতিল মতের ওপর ছিল।

===o===

দশম অধ্যায়

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আগেই সকল সৃষ্টির তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, প্রতিটি সৃষ্টিই তার অস্তিত্বের পূর্বেকার নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا ﴾ [الفرقان: ٢]

"তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২]

তিনি আরও বলেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ٤٩ ﴾ [القمر: ٤٩]

"নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" [সূরা আল-কামার, আয়াত: ৪৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا ﴾ [الاحزاب: ٣٨]

"আর আল্লাহর ফয়সালা সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৮]

আল্লাহ তা'আলা তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, ভালো ও মন্দ সবই। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

“আর যেন তুমি ঈমান আন তাকদীরের ওপ- এর ভালো ও মন্দের ওপর।”[3]

আর আল্লাহর জ্ঞান তাঁর তাকদীরকে আবশ্যক করে। কেননা যিনি তাকদীর জানেন তিনি ব্যতীত আর কেউ তাকদীর নির্ধারণ করতে পারেন না। তাকদীরের বিস্তারিত রূপ, সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অবস্থা, স্থান, উলট-পালট, শুরু কিংবা শেষ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا﴾ [الطلاق: ١٢]

“যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।” [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ১২]

তিনি আরও বলেন,

﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٤﴾ [الملك: ١٤]

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৪]

---

[3] মুসলিম, হাদীস নং ৮, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

আর যে তাঁর তাকদীর অস্বীকার করবে, সে তাঁর ইলম বা জ্ঞানকেই অস্বীকার করল। আর যে তাঁর ইলম বা জ্ঞানকে অস্বীকার করবে, সে তাঁর তাকদীরকে অস্বীকার করল।

আর সৃষ্টিকুলের তাকদীর আল্লাহর কাছে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ﴾ [الانعام: ٣٨]

“এ কিতাবে আমরা কোনো কিছুই বাদ দেই নি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৩৮]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ﴾ [يس: ١٢]

“আর আমরা প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ১২]

আর আল্লাহর সৃষ্টি দু’ ধরণের:

- নিয়োজিত, যাদের কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই। যেমন, গ্রহ-নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক।
- যাদের রয়েছে ইচ্ছাশক্তি ও ইখতিয়ার বা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। যেমন, মানব, জিন্ন ও ফিরিশতা। তিনি তাদেরকে ইখতিয়ার না দিয়ে পরিচালিত করেন নি যে, তাদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করবেন, এরপরও তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। আবার তিনি তাদেরকে পরিচালনা না করে যা খুশি করার

ইখতিয়ার দেন নি যে, তারা তাঁর কর্ম ও ইচ্ছার অংশীদার হয়ে যাবে। বরং তিনি তাদের জন্য ইচ্ছা সাব্যস্ত করেছেন, তবে সেটা তাঁর ইচ্ছার অধীন:

﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ۝٢٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ۝٢٨ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٢٩﴾ [التكوير: ٢٧، ٢٩]

“এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ, তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছে করেন।” [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ২৭-২৯]

আর আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে যা তারা করে তাও সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿قَالَ أَتَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ ۝٩٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ۝٩٦﴾ [الصافات: ٩٥، ٩٦]

“তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই ইবাদাত কর? অথচ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তা-ও।”[সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৯৫-৯৬]

আর আল্লাহ তা‘আলা কোনো কিছুর কারণ অস্তিত্বে এনেছেন এবং সেটাকে কারণ হিসেবে অনুমোদন করেছেন, যেমনিভাবে কারণের ফলাফলেরও অস্তিত্ব দিয়েছেন। তাঁর প্রশস্ত জ্ঞান ও মহাপ্রজ্ঞার চাহিদা

এটিই যে, এ জগতকে একটি নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালনা করেন তিনি।

আর আল্লাহর তাকদীরের হাকীকত বা গূঢ় রহস্য ও হিকমত তথা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য না বুঝার কারণে কোনো বিবেক যেন ঈমান আনতে দ্বিধা না করে। কারণ, কোনো কোনো হিকমত এমন রয়েছে যা বিবেক যথাযথভাবে আয়ত্ব করতে পারে না। কারণ, বিবেক হচ্ছে পাত্রের ন্যায়। আর কোনো কোনো হিকমত হচ্ছে সমূদ্রের পানির মত, সে পাত্র যা ধারণ করতে পারে না। যদি সেগুলোকে তার ওপর ঢালা হয়, তবে সেটাকে ডুবিয়ে ফেলবে এবং হয়রান করে ছাড়বে।

আবার কিছু কিছু হিকমত আছে যাতে দীর্ঘ চিন্তা শুধু বিস্ময়ই বাড়িয়ে দেয়। যেমন, চোখ যদি দ্বিপ্রহরের সূর্যের দিকে দীর্ঘসময় তাক করে রাখা হয়, তবে তা কষ্ট ও বিস্ময়ই বাড়িয়ে দেয়।

===o===

একাদশ অধ্যায়

মৃত্যু যথাযথ সত্য:

﴿كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ٢٦ وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]

“ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর, আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।” [সূরা আর রহমান, আয়াত: ২৬-২৭]

আর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে, মৃত্যুর পরে কবরের পরীক্ষা, শাস্তি ও শান্তি সম্পর্কে যা হবে তা যেভাবে অহীতে এসেছে সেভাবে ঈমান আনয়ন করা।

- আর পুনরুত্থান ও পুনরায় দণ্ডায়মান হওয়ার ওপর ঈমান আনতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ ٥١﴾ [يس: ٥١]

“আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৫১]

আর এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী আল্লাহর সাথে কুফরকারী:

﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمۡ تَكُنۡ ءَايَٰتِي تُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ وَكُنتُمۡ قَوۡمٗا مُّجۡرِمِينَ ٣١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيۡبَ فِيهَا قُلۡتُم

مَّا نَدۡرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّٗا وَمَا نَحۡنُ بِمُسۡتَيۡقِنِينَ ۝٣٢﴾ [الجاثية: ٣١، ٣٢]

"আর যারা কুফুরী করেছে (তাদেরকে বলা হবে), 'তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় নি? অতঃপর তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। আর যখন বলা হয়, 'নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন তোমরা বলে থাক, আমরা জানি না কিয়ামত কী? আমরা কেবল অনুমান করি এবং আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী নই।" [সূরা আল-জাসিয়াহ, আয়াত: ৩১-৩২]

তাহলে যারা আখিরাতকে সরাসরি অস্বীকার-ই করে, তারা তো কাফিরই:

﴿بَلۡ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝١١﴾ [الفرقان: ١١]

"বরং তারা কিয়ামতের ওপর মিথ্যারোপ করেছে। আর যে কিয়ামতে মিথ্যারোপ করে তার জন্য আমরা প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ১১]

- ঈমানের আরও অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে, হিসাব-নিকাশের ওপর ঈমান আনয়ন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ۝٤٧﴾ [الانبياء: ٤٧]

"আর কেয়ামতের দিনে আমরা ন্যায় বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না এবং কাজ যদি শষ্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব। আর হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমরাই যথেষ্ট।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৪৭]

- অনুরূপভাবে ঈমানের আরও বিষয় হচ্ছে, সাওয়াব ও শাস্তি, জান্নাত ও আগুনের ওপর ঈমান আনয়ন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمۡ فِيهَا زَفِيرٞ وَشَهِيقٌ ۝١٠٦﴾ [هود: ١٠٦]

"অতঃপর যারা হবে হতভাগ্য তারা থাকবে আগুনে এবং সেখানে তাদের থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ।" [সূরা হূদ, আয়াত: ১০৬]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلۡجَنَّةِ﴾ [هود: ١٠٨]

"আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে তারা থাকবে জান্নাতে।" [সূরা হূদ: ১০৮]

আর কাফিররা আগুনে যাবে এবং ঈমানদারগণ জান্নাতে যাবে। যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ٥٦ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٧﴾ [ال عمران: ٥٦، ٥٧]

“তারপর যারা কুফুরী করেছে আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। আর আল্লাহ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৬-৫৭]

- আর আখিরাতের বিষয়াদির মধ্য থেকে যা-ই কুরআন ও হাদীসের নস বা ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত, তার ওপর ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। যেমন, সিরাত, মীযান, হাউয, সৎকাজ ও মন্দকাজের আমলনামা।

===o===

দ্বাদশ অধ্যায়

একতাবদ্ধ থাকা ওয়াজিব। আর ইমাম তথা শাসক ব্যতীত একতাবদ্ধ থাকার সুযোগ নেই।

মুসলিমদের ইমামদের আনুগত্য করা যাবে আল্লাহর আনুগত্যের কারণে:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: ٥٩]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯] এখানে আল্লাহ তা‘আলা “তোমাদের মধ্যকার” দ্বারা ‘মুসলিমদের মধ্যকার’ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

কাফিরের ইমামতি বা কাফিরকে শাসক বানানো সঠিক হবে না, যেমনিভাবে তার হাতে বাই‘আত হওয়াও ঠিক হবে না। তবে যে আনুগত্য দ্বারা সাধারণ মানুষের জাগতিক প্রয়োজন মিটবে (উক্ত শাসকের নয়), শুধু সেখানেই কাফির শাসকের আনুগত্য করতে হবে।

যদি মুসলিমদের শাসক আলিম বা দীনী জ্ঞানে জ্ঞানী না হন, তবে তিনি আলিমদেরকে পরামর্শক হিসেবে গ্রহণ করবেন, যাতে দীন ও দুনিয়ার কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালিত হয়:

﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ [النساء: ٨٣]

“আর যখন শান্তি বা শঙ্কার কোনো সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রাসূল এবং তাদের মধ্যে যারা নির্দেশ প্রদানের অধিকারী তাদেরকে জানাত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সেটার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮৩] কারণ, মাসআলার তথ্য অনুসন্ধান করে বের করা কেবল আলিমদেরই কাজ।

আর শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয নেই, যেমনিভাবে তার সাথে ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়া করাও বৈধ নয়; বরং তার অত্যাচারের ওপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে; যদি-না সে সুস্পষ্ট প্রকাশ্য কুফুরী না করে বসে। কারণ সহীহ হাদীসে রয়েছে, উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا»

“তোমাদের ওপর কিছু শাসক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে, তাদের কর্মকাণ্ড কিছু কিছু তোমাদের কাছে পছন্দনীয় হবে, আবার কিছু কিছু খারাপ লাগবে; সুতরাং যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে অপছন্দ করবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে, আর যে ব্যক্তি তাদের অন্যায় অস্বীকার করবে, সে নিরাপদ হবে, কিন্তু যে মেনে নিবে এবং অনুসরণ করবে সে ব্যতীত (সে নাজাত পাবে না)।” সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, “**না, যতক্ষণ তারা সালাত কায়েম করবে।**”[4]

আর শাসকদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে নসীহত করা হবে, যাতে করে তার ক্ষতি দূরীভূত হয় অথবা ক্ষতির পরিমাণ কমে আসে, তার ওপর প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে অন্তরের ঝাল মিটানোর জন্য নয়। কারণ, সহীহ হাদীসে এসেছে, তামীম আদ-দারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

“দীন হচ্ছে নসীহত তথা কল্যাণ কামনার নাম।” আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, “আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম শাসকদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য।”[5]

আর শাসকের গোপন তথ্য খুঁজে বেড়ানো, তার ব্যক্তিগত বিশেষ পদস্খলনকে ফলাও করে প্রচার করা, তার দোষ-ত্রুটি ও অপরাধসমূহ প্রসার করা জায়েয নেই। বরং তাকে একান্তভাবে এ ব্যাপারে নসীহত করা হবে।

যদি কোনো খারাপ কিছু সে মানুষের মধ্যে চালু করে বা বিধান হিসেবে দেয় এবং সেটাকে প্রচার-প্রসার করে, তবে যদি এটা জানা যায় যে তাকে একান্তভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হলে সে ফিরে আসবে,

---

[4] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫৪।

[5] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫।

প্রত্যাবর্তন করবে এবং সঠিক হয়ে যাবে তাহলে নির্দিষ্টভাবে তা-ই করতে হবে। আর যদি তা না হয়, তবে সেই খারাপ-প্রচলনটি মানুষের সামনে বর্ণনা করা হবে। কারণ, এটিই হচ্ছে তাদের প্রতি আবশ্যক নসীহত ও কল্যাণ কামনা, আর তার ও তাদের দীনী অধিকার; যাতে করে আল্লাহর শরী'আত পরিবর্তিত না হয়ে যায়, আল্লাহর দীন নষ্ট না হয়ে যায়। এটা মূলত "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম শাসকদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য নসীহত" –এর অন্তর্ভুক্ত। আর তা অন্য অধিকারের ওপর প্রাধান্য পাবে।

কোনো আলিম সাধারণ মানুষদের অবস্থা ও তাদের কল্যাণকর বিষয়কে বাদ দিয়ে নিজেকে নিয়ে একাকীত্ব অবলম্বন করবে না। **দুনিয়ার বুকে প্রশংসিত যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখিতা হচ্ছে** তা-ই, যা মানুষ একান্তভাব নিজের অংশে সাধন করে; কিন্তু মানুষের অংশে তাদের দুনিয়াবী প্রয়োজনে এগিয়ে না আসা প্রশংসিত নয়। সুতরাং তার উচিত হবে এক দিরহাম দিয়ে হলেও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, একটি খেজুর দিয়ে হলেও ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া। কারণ, আলিমেরও রয়েছে অভিভাবকত্ব, আর মানুষের দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড ঠিক করে দেওয়া তাদের দীনকে ঠিক করে দেওয়ার একটি দরজা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সম্পদের দিকে মাথা তুলে তাকান নি, কিন্তু সামান্য কিছু টাকার ব্যাপারে বারীরা ও অন্যান্যদের পক্ষ নিয়েছিলেন এবং মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে খুৎবা বা ভাষণ দিয়েছিলেন।

===O===

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। যতদিন পর্যন্ত কুরআন থাকবে, ততদিন এর বিধান যমীন থেকে রহিত হবে না। সহীহ হাদীসে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

"আমার উম্মতের মধ্যে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সর্বদা একটি বিজয়ী দল থাকবে, যারা হকের ওপর যুদ্ধ করবে।"[6]

আর প্রতিরোধজনিত জিহাদের জন্য প্রয়োজন নেই ইমামের অনুমতির, কিংবা কষ্ট দূরীভূত করা ও প্রতিহত করা ব্যতীত অন্য কোনো নিয়্যতের। এ জিহাদ ওয়াজিব, যদিও তা কেবল কোনো মুসলিমের সম্মান অথবা জান বা মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও হয়। এ জন্যই সুনান গ্রন্থসমূহে এসেছে,

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

"যে কেউ তার নিজের সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হবে সে শহীদ হবে, যে কেউ তার পরিবার-পরিজন অথবা জান অথবা দীন রক্ষা করতে গিয়ে

---

[6] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৬।

নিহত হবে সেও শহীদ।”[7] তাছাড়া হাদীসটি সহীহ হাদীসের গ্রন্থেও সংক্ষিপ্তাকারে এসেছে[8]।

আর সম্মান, জান ও মালের ওপর আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা ওয়াজিব, সে আক্রমণকারী মুশরিক হোক বা মুসলিম। কারণ, সুনান নাসাঈতে কাবূস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “এক লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, কোন লোক এসে আমার সম্পদ নিয়ে যেতে চায়?” রাসূল বললেন, “তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে উপদেশ দাও।” সে বলল, যদি সে আমার নসীহত গ্রহণ না করে? তিনি বললেন, “তাহলে তার বিরুদ্ধে তোমার চারপাশে যে মুসলিমরা রয়েছে তাদের সাহায্য নাও।” সে বলল, যদি আমার চারপাশে কোনো মুসলিম না থাকে? রাসূল বললেন, “তাহলে তুমি প্রশাসনের সাহায্য নাও।” লোকটি বলল, যদি সরকার আমার থেকে দূরে থাকে? রাসূল বললেন, “তাহলে তুমি তোমার সম্পদ রক্ষার্থে যুদ্ধ কর, আর এতে করে তুমি আখিরাতের শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে অথবা তোমার সম্পদ রক্ষা করতে পারবে।”[9]

---

[7] হাদীসটি সাঈদ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আবু দাঊদ, হাদীস নং ৪৭৭২; তিরমিযী, হাদীস নং ১৪২১; নাসাঈ, হদীস নং ৪০৯৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৫৮০; সংক্ষিপ্ত আকারে। তিরমিযী বলেন, এটি একটি হাসান হাদীস।

[8] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪১, আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস।

[9] সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৪০৮১; ইবন আবি শাইবাহ, হাদীস নং ২৮০৪৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২৫১৪; ত্বাবরানী ফিল কাবীর, ২০/৩১৩।

আর জিহাদের ডাক পড়লে সেখানে সাড়া দিতে হলে, আল্লাহর বিধানকে বুলন্দ করা বা উপরে উঠানোর নিয়্যত থাকতে হবে। সহীহ হাদীসে এসেছে, আবূ মূসা আল-আশ‘আরী থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল, কোনো কোনো লোক যুদ্ধ করে গনীমতের মালের জন্য, কোনো কোনো লোক যুদ্ধ করে যাতে তার কথা বলা হয়, আর কেউ কেউ যুদ্ধ করে যাতে তার অবস্থান দেখাতে পারে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করল?’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أَعْلَى، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা বা বাণীকে উপরে উঠানোর জন্য যুদ্ধ করল, সে আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধ করল।”[10]

এ জিহাদে ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব, আল্লাহর নাফরমানী ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে অবশ্যই তার কথা শোনা ও মানা হবে। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»

“যে কেউ আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে কেউ আমার অবাধ্য হলো সে আমার আল্লাহর অবাধ্য হলো। আর যে কেউ আমার আমীর বা প্রশাসকের নির্দেশের আনুগত্য করল সে আমার

---

[10] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৩, ২৬৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৪।

আনুগত্য করল, আর যে কেউ আমার আমীরের অবাধ্য হলো সে আমার অবাধ্য হল।”[11]

===o===

[11] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭১৮; সহীহ সলিম, হাদীস নং ১৮৩৫। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু বর্ণিত হাদীস।

চতুর্দশ অধ্যায়

মানব জাতির মধ্যে আল্লাহর নাবীগণের পর সর্বোত্তম মানুষ হলেন মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ। তাঁদের মহামর্যাদার কথা প্রবিত্র কুরআনের মধ্যে এসেছে। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: 29]

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: 29]

যেমন নাবীগণের মর্যাদার মধ্যে তফাত রয়েছে, তেমনি সাহাবীগণের মর্যাদার মধ্যেও তফাত রয়েছে। নাবীগণের মধ্যে যে নাবীর মর্যাদা সব চেয়ে কম, তিনি হলেন সাহাবীগণের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী তাঁর চেয়েও অনেক বেশি মর্যাদার অধিকারী। আর সাহাবীগণের মধ্যে যে সাহাবীর মর্যাদা সব চেয়ে কম, তিনি হলেন তাবেয়ীগণের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী তাঁর চেয়েও অনেক বেশি মর্যাদার অধিকারী।

সাহাবীগণের মধ্যে যে সব সাহাবী অগ্রবর্তী এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই হলেন সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী। তাই যে সাহাবী আল্লাহর নাবীর প্রতি ঐ সময় ঈমান আনয়ন করেছেন, যখন তিনি অসহয় অবস্থায় ছিলেন, তাঁর মর্যাদা ঐ সাহাবীর চেয়ে বেশি উত্তম, যে সাহাবী আল্লাহর নাবীর প্রতি ঐ সময় ঈমান আনয়ন করেছেন, যখন তিনি শক্তিশালী ও বলবান ছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর নাবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান আনয়ন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾ [الحديد: 10]

“তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে।” [সূরা আল হাদীদ, আয়াত: 10]

﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ﴾ [التوبة: 100]

“আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট

হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।” [সূরা আত তাওবা, আয়াত: 100]

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন সাহাবী তাদের মধ্যে ঐ দশ জন সাহাবী হলেন সর্বোত্তম মানুষ, যে দশ জন সাহাবীকে জান্নাত প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর উক্ত দশ জন সাহাবীদের মধ্যে চার জন খুলাফায়ে রাশেদীন সাহাবী হলেন সর্বোত্তম মানুষ। অতঃপর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ হলেন সর্বোত্তম মানুষ। এই সমস্ত সাহাবীগণের পর ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ হলেন সর্বোত্তম মানুষ। এবং এই সমস্ত সাহাবীগণের পর বৃক্ষের নীচে আনুগত্যের শপথ গ্রহণকারী সাহাবীগণ হলেন সর্বোত্তম মানুষ। এই বৃক্ষের নীচে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার নাম হলো বাইয়াতুর রিদওয়ান। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: 18]

“আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করছিলেন**। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের** অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার প্রদান করেছেন**।** ”[সূরা আল ফাতহ, আয়াত: 18]

এই বিষয়ে সঠিক হাদীস উল্লিখিত হয়েছে:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتُمُ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ».

(صحيح البخاري، رقم الحديث 4154، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث 71 - (1856)،).

অর্থ: জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন: "তোমরাই ভূপৃষ্ঠের উপরে সর্বোত্তম মানুষ।"[12]

বাইয়াতুর রিদওয়ানে বৃক্ষের নীচে আনুগত্যের শপথ গ্রহণকারী সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল এক হাজার চার শত জন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ হলেন অহী তথা পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের ধারক বাহক ও প্রকৃত প্রচারক। তাই তাঁদের দোষ চর্চা করা কিংবা দোষত্রুটি উল্লেখ কতাঁদেরকে অপবাদ দেওয়ার অর্থ হলো ইসলামের মধ্যে এবং তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া। এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ স্থাপন করা। অথচ তাঁরা হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক। তাই আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

---

[12] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 4154 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 71 - (1856), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।

« وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِيْ؛ فَإِذَا ذَهَبْتُ؛ أَتَى أَصْحَابِيْ مَا يُوعَدُوْنَ، وَأَصْحَابِيْ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي؛ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِيْ أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ».

(صحيح مسلم، رقم الحديث 207 – (2531)).

অর্থ: "আমি আমার সাহাবীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দুর্গ স্বরূপ। অতএব যখন আমি ইহকাল ত্যাগ করবো, তখন তাঁদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে অশান্তি, মতানৈক্য এবং ফ্যাসাদ প্রকাশ পাবে। এবং আমার সাহাবীরা আমার উম্মতের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দুর্গ স্বরূপ। অতএব যখন তাঁদের যুগের অবসান ঘটবে, তখন আমার উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অশান্তি, মতানৈক্য এবং ফ্যাসাদের সুত্রপাত ঘটবে।"[13]

সাহাবীগণ ভুলের ঊর্ধ্বে নন, তবে তাঁদের ভুলের কারণে তাঁদের দোষ চর্চা করা এবং তাঁদেরকে অপবাদ দেওয়া বৈধ নয়। তাঁদের মতভেদের সমস্ত কথা বর্জন করা উচিত। কিন্তু তাঁদের মতভেদের ঐ সব কথা উল্লেখ করা যাবে যে সব কথার মধ্যে ফিকহের জ্ঞান লাভ হবে এবং সত্যের উপদেশ পাওয়া যাবে। এবং এই সব ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদের কথা সম্মানের সহিত উপযুক্ত অজুহাত পেশ করেই উল্লেখ করতে হবে। যেহেতু সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হোক আর ঐকমত্য সৃষ্টি হোক, তাঁরা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। কেননা মহান আল্লাহ তাঁদেরকে

[13] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 207 - (2531)

মহামর্যাদা প্রদান করেছেন এই জন্য যে তাঁরা আল্লাহর নাবীর সাথে ভালোভাবে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছেন, আর শুধু মাত্র এই জন্য নয় যে তাঁরা তাঁদের মধ্যে একে অপরের সাথে ভালোভাবে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তাই জেনে রাখা উচিত যে, তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী বিধানকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার বিষয়ে গবেষণামূলক প্রয়াসের ক্ষেত্রে। তাই তাঁদের মধ্যে এই বিষয়ে ভুল হয়ে গেলেও তাঁরা মহান আল্লাহর কাছে থেকে পুণ্য লাভ করবেন এবং তাঁরা পুণ্যবান মানুষ হিসেবেই বিবেচিত হবেন। আর মহান আল্লাহর নাবীর বিরুদ্ধাচরণ করার বিষয়টি হলো মহা অন্যায় বা জুলুম, এই মহা অন্যায় বা জুলুম থেকে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে পবিত্র করে রেখেছেন। যেহেতু তাঁরা মহান আল্লাহর নাবীর সাথে সদ্ব্যবহার সর্বোত্তম পন্থায় স্থাপন করেছেন এবং বজায় রেখেছেন। আর এই কারণেই তাঁদেরকে মানব জাতির মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

আর সাহাবীগণের মধ্যে যে সব মতভেদের ঘটনা ঘটেছে, সে সব ঘটনার মধ্যে কোনো এক জন সাহাবীর কথা উল্লেখ করা হলে, অন্য সমস্ত সাহাবীর কথা চলে আসবে। তাই এই বিষয়ে তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কোনো প্রকারের মন্তব্য পেশ করা থেকে বিরত থাকার পথ অবলম্বন করেছেন।

ওমার বিন আব্দুল আজীজকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আলী এবং ওসমান দুই খলীফার বিষয়ে এবং জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধের বিষয়ে এবং সাহাবীগণের মধ্যে যে সব মতভেদের ঘটনা ঘটেছে সেই সব বিষয়ে।

তাই তিনি উত্তরে বলেছিলেন: “সেই সমস্ত রক্ত থেকে মহান আল্লাহ আমার দুই হাতকে রক্ষা করেছেন। তাই আমি আমার জিহ্বাকে সেই রক্তে ডুবাতে বা নিমজ্জিত করতে ঘৃণা করি।” [14]

পরকালে কেয়ামতের দিনে সাহাবীগণের পরের মুসলিমদেরকে সাহাবীগণের মধ্যে যে সব মতভেদের ঘটনা ঘটেছে, সেই সব বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা হবে না, কিন্তু তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, তারা সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট মর্যাদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল কি না? এই বিষয়েই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

===O===

[14] ইবনু সায়াদের আত তবাকাতুল কুবরা (5/394) এবং ইবনু আসাকিরের তারীখু দিমাশক (65/133) ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আহলে কিবলা তথা কিবলাকে মেনে চলে এমন কাউকে কুফুরী ব্যতীত অন্য গোনাহের কারণে আমরা কাফির বলব না।

কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে, আল্লাহকে গালি দেওয়া।

আর আল্লাহকে গালি দেওয়া তাঁর সাথে শির্ক করার চাইতেও মারাত্মক। কারণ, মুশরিকরা আল্লাহকে পাথরের স্থানে নামিয়ে আনে নি, বরং পাথরকে আল্লাহর স্থানে উঠিয়েছে:

﴿تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ۝٩٧ إِذۡ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٩٨﴾ [الشعراء: ٩٧، ٩٨]

“আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টিকুলের রব-এর সমকক্ষ গণ্য করতাম।” [সূরা আশ-শু‘আরা: ৯৭-৯৮] আর যে আল্লাহকে গালি দেয়, সে আল্লাহকে পাথরের চেয়েও নিম্নস্তরে নামিয়ে ফেলে !

আর আল্লাহকে গালি দেওয়া বড় কুফুরী। আর ঈমানের মতই কুফুরী বাড়ে ও কমে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ﴾ [التوبة: ٣٧]

“কোনো মাসকে পিছিয়ে দেওয়া তো শুধু কুফুরীতে বৃদ্ধি সাধন করা।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৭]

তিনি আরও বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمَٰنِهِمۡ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّن تُقۡبَلَ تَوۡبَتُهُمۡ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ٩٠﴾ [ال عمران: ٩٠]

“নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর কুফুরী করেছে তারপর তারা কুফুরীতে বেড়ে গিয়েছে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। আর তারাই পথভ্রষ্ট।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯০]

কিন্তু কুফুরীর বাড়তি ও কমতি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করবে না, বরং তার শাস্তি কঠোর করা হবে অথবা হাল্কা করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدۡنَٰهُمۡ عَذَابٗا فَوۡقَ ٱلۡعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفۡسِدُونَ ٨٨﴾ [النحل: ٨٨]

“যারা কুফুরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমরা তাদের শাস্তির ওপর শাস্তি বৃদ্ধি করব; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৮]

আর আমরা নির্দিষ্ট কোনো লোকের ব্যাপারে জান্নাত বা জাহান্নামের সাক্ষ্য প্রদান করব না, যতক্ষণ না এ সাক্ষ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে আসবে। তবে আমরা সাক্ষ্য দেই যে, যারা মুমিন অবস্থায় মারা যাবে

তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে, আর যারা কাফির অবস্থায় মারা যাবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

===০===

ষোড়শ অধ্যায়

স্বাধীনতার প্রকৃতি হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অপর সকলের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত থাকা। স্বাধীনতা দ্বারা যদি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ থেকে বের হয়ে যাওয়া অনুধাবন করা হয়, তবে তা হবে আত্মার পৌত্তলিকতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব। আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَـٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٣﴾ [الجاثية: ٢٣]

"তবে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আর তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তিনি তার কান ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন। আর তিনি তার চোখের ওপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে হেদায়াত দিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" [সূরা আল-জাসিয়াহ, আয়াত: ২৩]

আর কেউ যদি মানুষের জন্য যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা করা বা বলার অনুমোদন দেয়, তবে সে তার প্রবৃত্তি ও শয়তানের দাসত্বেরই স্বীকৃতি দিল। কারণ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দাস হিসেবে; সে যদি আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ না করে, তবে অন্যের দাসে পরিণত হবে- নিঃসন্দেহে!

আর যদি দুনিয়াতে শুধু একটি লোক থাকত, তাহলে আল্লাহ তার ওপর হত্যা, অপবাদ, ব্যভিচারের শাস্তি অবধারিত করে দিতেন না,

অনুরূপভাবে তার ওপর নির্দেশনা থাকত না লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো থেকে চোখ বন্ধ করার, তেমনি থাকত না মীরাসের বিধি-বিধান, তার ওপর হারাম করা হতো না ব্যভিচার, সূদ ইত্যাদি। আল্লাহ তো তখনই এ বিধি-বিধানগুলো দিয়েছেন, যখন সেখানে তারই জাতিভুক্ত অন্যরা রয়েছে। সংখ্যায় যখন অন্যরা বেশি হয়, তখনই জীবনে নিয়ম-শৃংখলা বেড়ে যায়। যদি আকাশে কেবল চাঁদই থাকত, তবে আল্লাহ তাকে এই নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিয়ন্ত্রণ করতেন না, কিন্তু তিনি করলেন সূর্য, যমীন ও গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমনের সাথে সঠিকভাবে চলার স্বার্থেই। অনুরূপভাবে জোতিষ্কের সংখ্যা যত বেড়ে যায়, ততই এগুলোর শৃঙ্খলাও বেড়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثِيثٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۭ بِأَمۡرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الاعراف: ٥٤]

“তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়!” [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪]

তিনি আরও বলেন,

﴿لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ ٤٠﴾ [يس: ٤٠]

“সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৪০]

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিধি-বিধান দীন ও দুনিয়া উভয়টিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে প্রণীত হয়েছে। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর বিধান থেকে বের হতে চাইবে, সে তাঁর শাস্তির হকদার হবে।

ইসলামে প্রবেশ করা আবশ্যক, আর ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ মুরতাদ হওয়া-

﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢١٧﴾ [البقرة: ٢١٧]

“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৭]

তাছাড়া সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

“যে কেউ তার দীন পরিবর্তন করবে তাকে তোমরা হত্যা করবে।”[15]

---

[15] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৫৪। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস।

বস্তুতঃ **আল্লাহর দাসত্ব** হচ্ছে সৃষ্টি ও অস্তিত্বের মূল লক্ষ্য। যে ব্যক্তি এর থেকে বের হওয়া বৈধ মনে করবে, সে অস্তিত্বের মূল লক্ষ্যের প্রতি-ই ঈমান আনে নি। সে কিন্তু কোনো রাষ্ট্র বা আইন প্রভৃতি দুনিয়ার নিয়মনীতির বাইরে চলা বৈধ মনে করে না, অথচ আল্লাহর দাসত্ব থেকে বের হওয়া বৈধ মনে করে! এটা সৃষ্টির অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসে দুর্বলতা অথবা অন্তর থেকে এ বিশ্বাস একেবারেই উধাও হয়ে যাওয়ার-ই গোপন স্বীকৃতি। অথচ আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

যে সত্ত্বা মানুষ ও জিন্নকে দুনিয়াতে তাঁর ইবাদতের জন্য অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি আখিরাতে তাদেরকে তাঁর হিসাব, সাওয়াব ও শাস্তির জন্য অস্তিত্বে নিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের অবস্থা ও পরিণাম পরিশুদ্ধ করে দিন। আর আল্লাহ দুরূদ ও সালাম পাঠ করুন তার নাবীর ওপর ও তার অনুসারীদের ওপর।

এ গ্রন্থটি একটি প্রশ্নের জবাব, যে প্রশ্নটি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন বান্দাকে প্রশ্ন করা হবে, আর তা হচ্ছে আল্লাহ হক্ক, যা তিনি নূহ ও তার পরবর্তী সকল নাবী রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, আর যার দ্বারা ইসলামের রিসালাতের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করার মাধ্যমে।